বঙ্গবন্ধু ও বাকশাল

অধ্যাপক শামস্ রহমান

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এক রাজনৈতিক দল অন্য দলকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য। সেটাই স্বাভাবিক। তা দেশে-বিদেশে সমানভাবে বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিএনপি সহ অন্যান্য দল, বিশেষ করে ১৯৭৫'এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে, তারা আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করার জন্য 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) শব্দটি ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। ইদানিং ব্যবহারের মাত্রাটা বেশ বেড়েছে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে গত এক সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তত দুটি অনুষ্ঠানে বাকশালের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত বাকশাল ছিল একটি সর্বোত্তম পন্থা'। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই সব প্রশ্ন থেকে একটি প্রধান প্রশ্ন বেড়িয়ে আসে আর তা হচ্ছে - তবে কি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নতুন করে বাকশালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের প্রথমে জানা প্রয়োজন - বাকশাল কি? কেনই বা বঙ্গবন্ধু এই ধরণের এক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়াস নিয়েছিলেন? সারা জীবন যে রাজনীতিক ওয়েস্টমিন্সটার স্টাইলের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি কি কারণে বাকশাল পদ্ধতি প্রণয়ন করেন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেন। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এই বিষয়টা সাধারণ জনগন এবং বিশেষ করে আমাদের প্রজন্মের কাছে এখনও অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে বলে আমার ধারণা। আর এই ধারণা থেকেই আজকের এ লেখার প্রয়াস।

উনিশ্য পঁচাত্তর সনে ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৫ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল পদ্ধতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের এক অংশ অষন্তোষ প্রকাশ করে, নীরবে প্রতিবাদ করে। অন্য এক অংশ প্রচারণা চালায় এই বলে যে, বাকশাল প্রবর্তনের মাঝে চিরস্থায়ীভাবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হওয়াই বঙ্গবন্ধু মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানেই শেষ নয় - অন্য আর এক অংশ ষড়যন্ত্র করে - অরাজনৈতিক পন্থায় বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করার জন্য (অবশ্য এ ষড়যন্ত্র চলছিল স্বাধীনতার পর থেকেই)। উন্নিশ্য পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাঝে ষড়যন্ত্রকারীদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়।

বাকশাল প্রবর্তনে যারা অষন্তোষ প্রকাশ করে তারা মূলতঃ তিন শ্রেণীতে ভুক্ত।

একঃ স্বাধীনতা বিরোধী জামাত, রাজাকার, আলবদর, মসলিম লীগ সহ উগ্র ডানপন্থি গোষ্ঠি, যাদের রাজনীতি নিসিদ্ধ হয় ৭১'এর ভুমিকার জন্য।

দুইঃ উগ্র বামপন্থি গোষ্ঠি; এবং

তিনঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক অংশ। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে তারা বাকশালের বিরোধীতা করলেও, তাদের মন্তব্য ছিল অভিন্ন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা সবাই জোর প্রচারণা চালায় এই বলে যে, বাকশাল প্রবর্তনে গণতন্ত্রের মৃত্যু হবে, মানবাধিকার লংঘিত হবে। যারা ৭০ দশকে এ ধরনের মন্তব্য করে, তারা আজও সেই একই ভাবে ভাবে।

তৃতীয় শ্রণীভুক্তদের এই বাস্তবতাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে উন্নয়নশীল দেশে শুধু মাত্র বহুদলীয় পদ্ধতির মাধ্যমেই যে গণতান্ত্রিক একাধিকত্ব (democratic pluralism) অর্জিত হবে, তা প্রত্যাশা করা ভুল। কারণ বিশ্বে বহু দেশেই বহুদলীয় পদ্ধতির চালু থাকলেও গণতান্ত্রিক একাধিকত্ব অর্জিত হয়নি। যেমন, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নামে জিম্বাবিয়াতে রবার্ট মুগাবের দল শাসন করেছে প্রায় চল্লিশ বছর। মেক্সিকোতে দি ইন্সটিটিশন্যাল রেভুলুশনারী দল সে দেশ শাসন করে সত্তুর বছরের অধিক। তেমনি ভাবে সিংগাপুরে, মালেশিয়ায়, সোহার্তোর ইন্দোনেসিয়ায়, মার্কোসের ফিলিপিন্সে। দশকের পর দশক এই সব দল নিজ নিজ দেশ শাসন করেছে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নামে। উদাহরণ আরো অনেক।

বাকশাল একটি কন্সেপ্ট যার বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয়েছিল বহুদলের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম। আওয়ামী লীগ এই প্লাটফর্মের প্রধান দল হলেও বাংলাদেশ ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, জাতীয় পার্টি সহ ছোট ছোট আরও বেশ কয়েকটি দল বাকশালের অন্তভুক্ত হয়। মোট কথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে সব দল উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিল, মূলত সেই সব দল নিয়েই গঠিত হয় বাকশাল। অন্যান্য দল যেমন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) (যার জন্ম স্বাধীনতার পর), পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি তখন আন্ডার-গ্রাউন্ডে থেকে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতা তৎপরতায় চালায়। সেই সাথে স্বাধীনতার পর মসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলামী নিসিদ্ধ হয় ৭১'এ তাদের ভুমিকার জন্য। জনগন-কেন্দ্রিক গণমুখি একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্মের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করাই ছিল বাকশালের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এটাও সত্য এ ব্যবস্থা ছিল সাময়িক। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেনঃ 'এটা অস্থায়ী (ব্যবস্থা), সময় এলে এটা সরিয়ে নওয়া হবে' (প্রথম আলো, অগাস্ট ২০১৭, তোয়াব খান, ততকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারী)। রাষ্ট্রের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনে প্রবর্তিত হয় বাকশাল।

এবার ফিরে আসি সেই আগের প্রশ্নে – সারা জীবন যে মানুষটি ওয়েষ্টমিন্সটার স্টাইলের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি কি কারণে বাকশাল পদ্ধতি প্রণয়ন করেন? আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি কোন্ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপটি নেয়া হয়? এটা আমাদের এবং বিশেষ করে আমাদের প্রজন্মের জানা ও বোঝার বিশেষ প্রয়োজন।

দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে মাত্র। চারিদিকে ধ্বংস আর অভাবের ছাপ। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য সামগ্রীর সহ অন্যান্য জিনিসের দাম বেড় যায় অতি দ্রুত। যেমন, ১৯৭০-৭৪ মাঝে স্বালানি তেলের দাম ব্যরেল প্রতি বেড়ে যায় প্রায় নয় গুণ (Statistica, OPEC crude oil price, access, 10 Dec., 2017); চালের দাম প্রায় চার গুণ; গমের দাম আড়াই গুণ, এবং চিনির দাম প্রায় ছয় গুণ (World Data: 1850-2015 – by Roger and Ritchie)। ফলে, ভোক্তার মূল্য সূচক (consumer price index - CPI) বৃদ্ধি পায় ৫২ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ যথাক্রমে ১৯৭২, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সনে। মূদ্রাস্ফীতির ফলে প্রান্তিক কৃষক, কৃষি এবং শহুরে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় অতি দ্রুত কমতে থাকে (Islam, N, 2005, The Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale, The University Press Limited, Dhaka)। উল্লেখ্য, সেই সময় বাংলাদেশে ভুমিহীন মানুষের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ (Osmani, S R, 1987, The Food Problem in Bangladesh, UN WIDER Working Paper 29, November)। ফলে

তাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। যদিও ১৯৭৪ সনে ধানের ফলন ১৯৭৩'এর ফলন থেকে অধিকতর ছিল, তথাপি, ১৯৭৪'এ বন্যার কারণে পাটের আবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে, কৃষক শুধু ক্যাশ আয় থেকেই বঞ্চিত হয়নি, পরবর্তি আমন চাষের উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পরে (Islam, N, 2005, The Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale, The University Press Limited, Dhaka)। তাতে মানুষের মনে অভাবের আশঙকা বেড়ে যায়। সেই সাথে স্পেকুলেটিভ (speculative) বাজার আচার-আচরণ পরিস্থিতি আরও নাজুক করে তুলে। পত্র-পত্রিকায় সত্য-মিথ্যায় সরকার বিরোধী প্রচারণা তখন তুঙ্গে। সরকারের কোষাগারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মূদ্রা না থাকায় এবং বিশ্ব বাজারে খাদ্যশষ্যের দাম দ্রুত গতিতে বেড়ে যাওয়ায় (যা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি) ঘারতি পূরণে খাদ্য আমদানি ব্যাহত হয় দারুনভাবে। তখন বাংলাদেশের ঋণযোগ্যতা (creditworthiness) ছিল অত্যন্ত নিম্নে। ফলে স্বল্প মেয়াদি কমার্সিয়াল ক্রেডিটের আওতায় বেশ কয়েকটি খাদ্য আমদানি যুক্তি হয়েও বাতিল হয়ে যায়। ১৯৭৪'এর সেপ্টেম্বর - অক্টোবরে যেখানে প্রয়োজন ছিল ২৫০ থেকে ৩০০ হাজার টন খাদ্যশষ্যের, সেখানে আমদানি করা সম্ভব হয়েছিল মাত্র ২৯ থেকে ৭০ হাজার টন। নূরুল ইসলাম পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবেঃ 'there were very little foreign exchange resources and that prices in the world market were sky high. Even if by some turn of luck we could get commercial credit and were able to purchase, we could not possibly ship it on time. There was a great demand on shipping space in view of many countries rushing to buy food in the face of the worldwide food crisis' (Islam, N, 2005, p. 224: The Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale, The University Press Limited, Dhaka)।

এই ছিল সার্বিক পরিস্থিতি।

তবে ধ্বংস আর অভাবের মাঝেও নব গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল সীমাহীন এবং সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। সরকার যখন জনগণকে নূনতম নিত্য প্রয়োজনীয় পৌঁছে দিতে হিমশিম খাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বৃহত্তর বিরোধী দল হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল)। তাদের উদ্দেশ্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তবে তাদের কাছে মার্ক্সের সমাজতন্ত্র তত বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়নি। তাই জাসদের সমাজতন্ত্রের আগে জুড়ে দেয় 'বৈজ্ঞানিক' নামক এক বিশেষন। তখন জাসদের গণবাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরতলীতে সৃষ্টি করে এক ত্রাসের রাজত্ব। ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের উপর অত্যাচার, কৃষকের উপর জুলুম, থানা আক্রমণ ও অস্ত্র লুট, গুপ্ত হত্যা - এসব ছিল প্রতিদিনকার ঘটনা। এসব কর্মকান্ড বিপ্লবের অংশ হিসেবে জাহির করলেও, বাস্তবে তা ছিল হটকারিতা। এসবই যে হটকারিতা ছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় যখন দেখি ১৯৭৫ পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লেবাস ছেড়ে দলের নেতাদের কেউ রাতারাতি ধর্মের নামে রাজনীতির ঝান্ডা উড়াতে- যেমন জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মেজর(অবঃ) এম এ জলিল। কিংবা সামরীকতন্ত্রের বীর সৈনিকরুপে আত্নপ্রকাশ করে- যেমন জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব। তার এ রাজনৈতিক রুপ এখনও বদলানি। তাই আজ এ দল, কাল অন্য আর এক দল এবং এ করেই চলছে। এবারের নির্বাচনে জামাতের সাথে বিএনপি'র ধানের শীষ নিয়ে লড়েছেন। জাসদের কেউ কেউ আবার মন্ত্রীত্বের শপদ নেয় রাজাকার-আল বদরদের সাথে একি কাতারে- যেমন, শাহজাহান সিরাজ।

তারা প্রত্যেকে সেই সময়ের জাসদের শীর্ষস্থানীয় নেতা। মাত্র ৩-৪ বছরের মাথায় তাদের পক্ষে কি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে ধর্মীয়, সামরিক একনায়কতন্ত্র কিংবা স্বাধীনতা বিরোধীদের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া বা মিলে যাওয়া কি সম্ভব? তবেকি উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক হটকারিতার মধ্য দিয়ে নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যহত করা? তাহলে তা কার সার্থে? কাদের হয়ে? এ বিষয়টা গবেষণার দাবি রাখে। রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শীঘ্রই গবেষণায় মনোনিবেশ করবেন বলে আমি আশ কারি।

অস্বীকার করার উপায় নেই সেই সময় জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল হাজার হাজার মেধাবী যুবককে, যারা হয়ে উঠে গণবাহিনীর সক্রিয় সদস্য। জাসদের হটকারীতার পরিক্ষা-নিরিক্ষার মাঝে বিনষ্ট হয় এই সব অনেক যুবকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এর জন্য জাসদের রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বীক গুরুরা দায়ী। নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতাদের মত জাসদের নেতৃবিন্দদেরও কি জাতির কাছে মাফ চাওয়া উচিত?

জাসদ যখন ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে, তখন সুযোগ বুঝে গোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। এখানে উল্লেখ্য, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ জামাত মসলিম লীগের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন। অর্থ ও অস্ত্রের জন্য তারা পাকিস্তানের কাছে ধরনা দিতেও পিছ পা হয়নি। পাকিস্তানের ততকালিন প্রধানমন্ত্রি ভুট্টোর কাছে অর্থ ও অস্ত্র চেয়ে আবেদন করে (সোহরাব হাসান, আগস্ট ০৮, ২০১৬, প্রথম আলো)।

এসব দেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনা।

দেশের বাইরে তখন কি ঘটছিল? বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা, '৭১'এ সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাকিস্তানী সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক প্রক্সি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ফলে, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিকে পুনরায় একতাবদ্ধ করার জন্য আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করে। সৌউদি আরব সহ বেশ কয়েকটি আরব দেশ বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দানে তখনও বিরত। মানবতাকে উপেক্ষা করে কেবল আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রি চীন শুধু বাংলাদেশের গণ মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতাই করেনি, বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে বিরত থাকে। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে, অন্যদিকে যুদ্ধে পাকিস্তানকে সামরিক এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে নিক্সন ছিল বদ্ধপরিকর। তাই উপেক্ষা করে ২৫ শে মার্চের বাঙালি নিধন। নিক্সনের পছন্দের মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম। তবে পছন্দের কয়েকজনের মধ্যে ইয়াহিয়া খান ছিল একজন (Bass, G. 2013, The Blood Telegraph, p. 7)। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বারবার ব্যখ্যা দেওয়া সত্যেও হেনরী কিসিঞ্জারের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ ও বাঙালি রাজনৈতিকভাবে বাম (কিসিঞ্জার বলে - "Mr President (নিক্সন), ... the Bengalis... are by nature left' (Bass, G, 2013, The Blood Telegraph, p. 87)। আর তা থেকে ধীরে ধীরে কিসিঞ্জারের কাছে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর পর দ্বিতীয় ঘৃণ্য ব্যাক্তি। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের ধ্বংসস্তুপের উপর বসে যখন বঙ্গবন্ধু সরকারের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করার কথা, তখন অভ্যন্তরীন প্রতি বিপ্লবীদের সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়, ঠিক সেই সময় নিক্সন-কিসিঞ্জারের মার্কিণ প্রশাসন পি এল ৪৮০ অধীনে খাদ্য

সামগ্রী সরবরাহ নানা অজুহাতে প্রায় নয় মাস ঝুলিয়ে রাখে। শেষে কিউবার সাথে পাটের ব্যাগের ব্যবসা করার দায়ে খাদ্য সরবরাহ চুক্তি বাতিল করে দেয়, আর যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে ১৯৭৪'এর দুর্ভিক্ষের তীব্রতায়। প্রশ্ন হচ্ছে – এটা কি ঘটে শুধুই কিউবার সাথে বানিজ্যের কারণে, নাকি এটা ঘটে ১৯৭১'এ উপমহাদেশের জিও–পলিটিক্সসে হেরে যাওয়ার ফলে? বিষয়টা কিছুটা হলেও বোঝার জন্য একটি ঘটনার অবতারনা করছি। ১৯৭৩'এর অগাষ্টে বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিবের সাথে সাক্ষ্যাৎ করে খাদ্যশষ্য সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তখন তাকে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব যুদ্ধাপরাধী বিচার বন্ধ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে এ বিষয়ে এক লম্বা ফিরিস্তি দেন। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিবের উপদেশ দেওয়ার বক্তব্যটি নূরুল ইসলাম এভাবে তুলে ধরেছেনঃ 'When the Bangladesh Finance Minister called upon the US Secretary of State in August 1973, primarily to appeal for food aid, …. he (Secretary of State) gave his "occasional advise" for the speedy settlement of disputes with Pakistan. Referring to the proposal of Bangladesh for "war crimes" trials of the Pakistan army, he (Secretary of State) confirmed that humanity never learned from "war crimes" trials'.

এখানেই শেষ নয়। বায়াফ্রা যুদ্ধের (১৯৬৭–৭০) প্রসঙ্গ টেনে বলেনঃ 'He appreciated that the Nigerian government was pragmatic in not having "war crimes" trials following the Biafran war', এবং তাজউদ্দিনকে উপদেশ দেনঃ 'it was "not good to have such trials" (Islam, N, 2005, p. 235: The Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale, The University Press Limited, Dhaka)। সেই সময় মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নূরেম্বার্গের যুদ্ধাপরাধী ট্র্যালেরের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান!

এ সবই ছিল সেই সময়ের বহিঃর্বিশ্বের চাপ। দেশের ভিতরের প্রতিবিপ্লবী এবং সশস্ত্র দেশদ্রোহীদের প্রতিহত করে প্রশাসনকে দূর্নীতিমুক্ত করে এং সেই সাথে বহিঃর্বিশ্বের উপনিবেশিক শক্তিকে সামলিয়ে, সর্বস্তরে স্বাধীনতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভই ছিল বঙ্গবন্ধুর বাকশালের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হচ্ছে - এসব কি সম্ভব হতো? আজ প্রায় পয়তাল্লিশ বছর পর এই প্রশ্নটির অবতারণা হয়তো অবান্তর। তবুও! যদি একটু ভাবি – ১৯৭২ থেকে ৭৫ মাঝে কি হচ্ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নিয়ে? এবং তার সাথে তুলনা করি কি ঘটেছে ১৯৭৫'এর পর এই সব বিষয়গুলি নিয়ে? তাহলে হয়তো বা কিছুটা হলেও ধারনা জন্মাতে পারে - কি হতে পারতো বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্তত দশ বছরের জন্য হলেওঃ

- যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু হয়েছিল তা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যেত দীর্ঘদিন আগেই। আমাদের ২০১৩–১৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। যেমন তড়িৎ গতিতে ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীর বিচার।
- যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী দল পুনরায় রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। স্বাধীনতা অর্জনের এত অল্প সময়ের মাঝে পৃথিবীর কোন দেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা এ এক নজিরবিহীন ঘটনা।
- ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ হত। সেই সাথে অব্যহত থাকতো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাস্তবায়নে। ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি সমাজে নিয়ে আসে বৈষম্য। যে দেশ যতবেশী

বৈষম্যমূক্ত তারা ততবেশী সৃজনশীল। বিষয়টা এখন প্রমাণিত। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু মাত্র একটি রাজনৈতিক বা মানবিক বিষয় নয়, এর একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে।

- বিকৃত হত না বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। যে জাতি তার ইতিহাস সঠিকরূপে গ্রন্থিত করতে অপারক, সে জাতি নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ৭১'এর ইতিহাস গোপন রেখে অথবা সত্য-মিথ্যায় প্রকাশ করে পাকিস্তানের রাজনেতিক এবং সুশীল সমাজ আজ নতুন প্রজন্মের সামনে খানিকটা বিব্রত। তার প্রমাণ পাকিস্তানের মিডিয়ায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবরাখবর এবং রাজনৈতিক বক্তব্য ও বিশ্লেষণ। জাপান এবং অষ্ট্রেলিয়ার একই অবস্থা।
- বাকশাল প্রবর্তনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসতো। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। গত দশ বছরে রাজনীতি এবং অর্থনীতির এই সমিকরণটি প্রমাণ করেছে শেখ হাসিনা সরকার।

এককথায়, জাতীয় মূল্যবোধে দিধাবিভক্ত হত না বাংলাদেশ। আজ প্রায় অর্ধশত বছর পরও দেশ জাতীয় মূল্যবোধে দিধাবিভক্ত। বিভক্ত শিক্ষক শিক্ষকে; আমলাতন্ত্রে; চিকিৎসক-চিকিৎসকে, এককথায়, পুর সুশীল সমাজে। স্বাধীনতা অর্জনে যেমন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এক মঞ্চে সমেবত হওয়া প্রয়োজন, যা বাঙ্গালি জাতি প্রমাণ করেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, স্বাধীনতার মূল্যবোধ রক্ষাতেও তেমনি প্রয়োজন। সেই সাথে বাকশাল প্রবর্তনে প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিহত করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব ছিল।

মেলবর্ণ, ৭ এপ্রিল ২০১৯